OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 322 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 322 - 328
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

তারাশঙ্করের ‘কালিন্দী’ উপন্যাসে সাঁওতাল জীবন ও সংগ্রাম

গণেশ হেমব্রম
বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন
Email ID: ganeshhembram1979@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Zamindari System, Mercantile Capitalism, Santals, Rangababu, Kamal Majhi, Bimal Mukherjee.

Abstract
The central theme of Tarashankar Bandyopadhyay's novel Kalindi (1940) revolves around the conflict between the feudal zamindari system and emerging mercantile capitalism. In the process, the novel also touches upon the rich tradition of tantric practices in Birbhum and the historic Santal Rebellion of 1855. Alongside, it vividly portrays the customs, beliefs, festivals, marriage systems, and worldview of the Santal community. Being born into a zamindar family himself, Tarashankar approaches the Santals with deep empathy. While highlighting their rebellious spirit, he also describes the Santal society and culture with rare sensitivity, breaking away from the typical upper-caste gaze. Particularly captivating is the section where the Santal myths about the creation of the earth and the nature of their community are explored. This simple and innocent community has repeatedly been displaced from their homeland in the name of "development," pushing them towards an uncertain future. As a result, they remain marginalized to this day. According to the author, the root cause of this plight lies in people like Indra Ray (the zamindar), Shreebas Pal (the moneylender), and Bimal Mukherjee (the factory owner) — who have historically exploited the tribal Santals for their own selfish interests. Tarashankar expresses strong condemnation toward such ruthless and self-serving individuals throughout the novel.

Discussion

রাঢ় বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বহু বৈচিত্রময় জীবন ও ঘটনার সার্থক রূপকার। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘কালিন্দী’ উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে বণিকতন্ত্রের বিরোধ হলেও প্রসঙ্গক্রমে এসেছে বীরভূমের তন্দ্রসাধনার ঐতিহ্য, ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা এবং সাঁওতাল সমাজের নানান সংস্কার-বিশ্বাস, উৎসব-পরব, বিবাহ ও চিন্তা-চেতনা। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান তারাশঙ্কর সহমর্মিতাবোধে উজ্জীবিত হয়ে বীরভূমের আদিবাসী তথা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন ও তাদের বিদ্রোহী চেতনাকে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তিনি উচ্চবর্ণের দৃষ্টিতে আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিককে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণনা করেছেন এই উপন্যাসে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 322 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'কালিন্দী' (১৯৪০) উপন্যাসে লেখক জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে বণিকতন্ত্রের বিরোধ ও তার পরিণামকে উপস্থাপন করেছেন। স্বাভাবিকভাবে জমিদার ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে নতুন যুগের প্রতিনিধি ব্যবসায়ী বিমল মুখার্জীর সংঘাতই এই উপন্যাসে প্রধান্য লাভ করেছে। জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে বণিকতন্ত্রের এই বিরোধকে দেখাতে গিয়েই লেখক উপন্যাস মধ্যে সাঁওতাল জাতির প্রসঙ্গ এনেছেন। রাঙাবাবু অহীন্দ্রের কালিন্দী চর নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রবীন রংলাল ঘাড় নেড়ে জানায় যে, -

> "অ্যাই দেখেন, আপনি কিছুই জানেন না। চরে যে সাঁওতাল বসেছে গো? উই দেখেন, ধোঁয়া উঠছে না! বেটারা সব রান্না চড়িয়েছে। ওরাই তো চোখ ফুটিয়ে দিলে গো। আমাদের বাঙালী জাতের সাধ্যি কি, এই বন কেটে আর এই সব জন্তু-জানোয়ার মেরে এখানে চাষ করে! ওরা কিন্তু ঠিক বেছে বেছে আসল জায়গাটি এসে ধরেছে। কোথা থেকে এল আর কবে এল— কেউ জানে না, ওরা আপনিই এসেছে, আপন গরজেই জায়গা-জমি সাফ করে বসেছে, চাষ করছে, এই বার সব ঘর তুলেছে। গাঁয়ের লোক তো জানলে, ওখানে মাঝি বসেছে, চাষ হচ্ছে।"[১]

কালিন্দীর বুকে জেগে ওঠা এই চরকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে জমিদারের সঙ্গে জমিদারের, জমিদারের সঙ্গে প্রজার আবার কখনো জমিদারের সঙ্গে বণিক শ্রেণির বিরোধ বেধেছে। তবে চর নিয়ে গড়ে ওঠা জমিদারদের এই দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত চিনির কলমালিক বিমল মুখার্জীর আগ্রাসী নীতিরই জয় ঘোষিত হয়েছে। ফলে যে সাঁওতালরা একদা লোক চক্ষুর আড়ালে জেগে ওঠা চরের (কালিন্দী) ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করে সোনার ফসল ফলিয়েছিল সেই সাঁওতালরাই কৃষিভিত্তিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিণত হয় কারখানার অদক্ষ শ্রমিকে। সাঁওতালদের এই অসহায়তাবোধ, ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনকে তারাশঙ্কর অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন তাঁর এই 'কালিন্দী' উপন্যাসে।

সাঁওতালি পুরাকথার আলোকে সৃষ্টিতত্ত্ব : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কালিন্দী' উপন্যাসে রায় বংশের জমিদারদের মধ্যদিয়ে বীরভূমের তন্ত্রসাধনার ঐতিহ্য যেমন স্মরণ করেছেন তেমনি ভারতের আদিম অধিবাসী বলে পরিগণিত সাঁওতালদের সংস্কার বিশ্বাস তথা সষ্টিতত্ত্ব বা পুরাকথাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। 'কালিন্দী' উপন্যাসের একটি বিশিট স্থানীয় চরিত্র চরভূমির সাঁওতাল মোড়ল কমল মাঝি। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষ না থাকলেও তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব বা পুরাকথার জ্ঞান রাঙাবাবু অহীন্দ্রকে বিস্মিত করে। কথা প্রসঙ্গে কমল মাঝি অহীন্দ্রকে বলেছে— 'হ্যাঁ বাবু, এই যি পিথিমিটি, এই যে ধরতি মায়ী—ইকে কে গড়লে? কি লেখা আছে পুঁথিতে তুদের? অহীন্দ্র জানায় পৃথিবী হল গ্রহ, বুঝলি? আগে পৃথিবী দাও দাও করে জ্বলত। কিন্তু সাঁওতালরা এ দর্শনে বিশ্বাসী নয়। তাই কমল মাঝি অহীন্দ্রকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছে তাদের বিশ্বাসের কথা। সে মোটা গলায় গানের আকারে আরম্ভ করল—

"অথ জনম কু ধরতি লেণ্ডং
অথ জনম কু মানোয়া হড়
মান মান কু মানোয়া হড়
ধরতি কু ডাবাও আ-কাদা,
ধরতি সানাম কু ডাবাও কিদা।"[২]

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীতে শুধু জল আর জল ছিল। কোথাও কোনো জীবের অস্তিত্ব ছিল না। তবে জীবের অস্তিত্ব না থাকলেও স্বর্গে তখনো দেবতারা বাস করতেন। এরকমই দুই দেবতা হলেন ঠাকুর ও ঠাকরান। তাদের বার্তা বাহক ছিল লিটা (মারাংবুরু)। প্রতিদিন স্বর্গপুরী থেকে জলাপুরীতে স্নান করতে নামার সময় ঠাকুর কোনও না কোনও সামুদ্রিক প্রাণীকে সৃটি করতেন। এরকমই দুটি প্রাণী হল ল্যাণ্ডেৎ (কেঁচো) এবং হর-অ (কচ্ছপ)। পরবর্তীকালে এই দুটি প্রাণীর প্রচেটাতেই জলমগ্ন পৃথিবীর বুকে ভূপৃষ্ঠ গড়ে উঠেছিল। সামুদ্রিক প্রাণীকে সৃটি করার পর ঠাকুরের ইচ্ছা হয়েছিল মানুষকে সৃটি করবেন। কিন্তু সিঞ সাদম অর্থাৎ সূর্য ঘোড়া ঠাকুরের সেই ইচ্ছেকে পূর্ণ হতে দিলেন না। ঠাকুর তখন তাঁর শরীরের দুটি অঙ্গ হাঁস এবং হাঁসলি নামক জায়গা থেকে ময়লা ঘষে ঘষে দুটি পাখি তৈরি করেন এবং নাম দেন হাঁসহাসিল। হাঁস (পুরুষ) হাঁসিল (স্ত্রী) পাখি। পরবর্তীকালে পাখি দুটি হিহিড়িপিপিড়ি নামক জায়গাতে বাসা বাঁধে এবং দুটি ডিম দেয়। আর এই ডিম দুটি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 322 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

থেকেই পিলচু হাড়াম (পুরুষ) ও পিলচু বুড়হি (স্ত্রী) নামে দুই মানব শিশুর জন্ম হয়। সাঁওতালদের মতে এঁরাই হলেন তাদের আদি পূর্বপুরুষ। এরপরে তাদের সাত ছেলে ও আট মেয়ে হয়। এই ভাবেই কমল মাঝির কথায়— 'মানোয়া ধরতি সানাম কু ডাবাও কিদা। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী মানুষে ভর্তি হয়ে গেল। হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের বাইরে সেই আদিকালে সাঁওতালরা কি করে আদম-ইভের কাহিনির অবিকল কাহিনি বর্ণনা করেছিল তা ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগে। শিক্ষা-দীক্ষাহীন বন্যজাতির এই বৈজ্ঞানিক চেতনাকে তারাশঙ্কর অত্যন্ত সাবলিলভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর 'কালিন্দী' উপন্যাসে।

শিকার প্রসঙ্গ : সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে অরণ্যের কোলে প্রতিপালিত আদিবাসী তথা সাঁওতালদের জীবনে শিকারের একটা আলাদা গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। সাঁওতালরা কখনো একা একা যেমন শিকার করতে যায় না তেমনি শিকার করে আনা প্রাণীকেও একা একা ভক্ষণ করে না। শিকার করা জিনিসটিকে তারা আর পাঁচজনের কাছে সমানভাবে ভাগ করে খায়— যা তাদের আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ চেতনার রূপ। সুতরাং শিকার তাদের কাছে শুধুমাত্র একটা উৎসব মাত্র নয়— রীতিমতো একটা সংস্কৃতি। আদিবাসীদের শিকারের অন্যতম অস্ত্র হল তীর, ধনুক, টাঙ্গি বা কুঠার, লাঠি, বল্লম এবং ফাঁদ বা জ্বাল। মূলত চরম দারিদ্র বা অন্নাভাব থেকেই সাঁওতালরা পশুপাখি শিকারে যেতে বাধ্য হয়। 'কালিন্দী' উপন্যাসের দোকানী শ্রীবাস পালের কথার উত্তরে চরভূমির অন্যতম সাঁওতাল কাঠের পুতুল নাচের ওস্তাদের কথাতে যা স্পট। সে বলেছে— 'ঘরে চাল নেই, ছেলেপিলে সব খাবে কি? ওই গুলা সব পুড়ায়ে খাব।'

উৎসব-পরব : সাঁওতালরা দরিদ্র ক্ষেটে খাওয়া মানুষ হলেও তারা সারাবছর বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে, ঠিক যেন চর্যাপদের 'হাঁড়িত ভাত নাহি নীতি আবেশি'র মতো। তাদের প্রধান উৎসব দুটি-'বাহা' (হোলি) এবং 'সহরায়' (বাঁধনা)। এই দুটি উৎসবেই তারা তাদের আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে থাকে। তবে একমাত্র সহরায় পরবেই সাঁওতালরা নতুন পোষাক পরিধান করে। তাদের উৎসবের একটা অন্যতম বৈশিট্য তারা যেকোন অনুষ্ঠানে পুরুষ-মহিলা, বাবা-মা, ভাই-বোন একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে নাচ করে। তাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র-ধামসা-মাদল, বাঁশি, নাগড়া, কেন্দরি, ঘণ্টা, করতাল ইত্যাদি। প্রতিটি উৎসবের আগে সাঁওতাল রমণীরা ঘর-বাড়ি, দেওয়াল, মেঝে ইত্যাদি সুন্দর করে পরিষ্কার করে। কখনো কখনো খড়িমাটি দিয়ে দেওয়ালগুলিতে পশুপাখি, খেজুর গাছের ডাল, ধান ঘাছের ছবি ইত্যাদি অঙ্কন করে থাকে। যেকোন উৎসবের আগে শুভদিনে দেবতাকে সন্তুট করতে কখনো মোরগ, কখনো পশু বলি দেয়। আর এই কাজটা করেন গ্রামের যিনি নায়কে বা পুরোহিত হন। আলোচ্য 'কালিন্দী' উপন্যাসেও দেখি যেদিন সাঁওতালদের চরভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেদিন তারা মহাসমারোহে উৎসব পালন করেছে। লেখকের কথায়—

> "আজিকার দিন তাহাদের একটি পরমকাম্য শুভদিন, তাহাদের দেবতাকে তাহারা পূজা দিয়াছে। পাঁচটি লাল রঙের মুরগি, একটি লাল রঙের ছাগল বলি দিয়া নাকি পূজা হইয়াছে, তাহারপর আকণ্ঠ পচুই মদ খাইয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়াছে। অদ্ভুতজাত।"[৩]

সাঁওতালদের প্রধান জীবিকা চাষবাস। তাই প্রতিবছর আষাঢ় বা শ্রাবণমাসে নতুন ধান লাগানোর আগে তারা বাতুলী পরব পালন করে। একে তারা কদলেতা, রোওয়া বা বাইন পরবও বলে থাকে। 'কালিন্দী' উপন্যাসের অন্যতম মহাজন চরিত্র শ্রীবাস পাল সাঁওতালদের 'বাতুলী' পরব সম্পর্কে জানতে চাইলে মোড়ল কমল মাঝি উৎসাহিত হয়ে বলেছে - 'জাহের সারনে আমাদের দেবতার থানে গো পূজা হবে। এডিয়াসিম— আমাদের মোরগাকে বলে এডিয়াসিম, ওই মোরগা কাটা হবে, পচুই মদ দিব দেবতাকে, শাক দিব দু-তিন রকম। তারপর রাঁধা-বাড়া হবে উই দেবতা থানে, লিয়ে খেয়ে দেয়ে সব নাচ গান করব।'৪ উৎসবের সময় সাঁওতাল মেয়েরা মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ায়। খোঁপা বাঁধে, খোঁপায় সদ্য ফোটা বুনো কুর্চি ফুল লাগায়।

বিবাহ-নাচ-গান : ভারতের বিচিত্র ও ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি তথা আদি জনজাতির সমাজ-সংস্কৃতিই তারাশঙ্করের সাহিত্য সাধনার মর্মমূলে। রাঢ়ভূমির অন্যতম জেলা বীরভূমের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেকবেশি বৈচিত্র্যময়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 322 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও জীবন সম্পৃক্ত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে সাঁওতালদের নাচগান তথা সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন তাঁর 'কালিন্দী' উপন্যাসের বেশ কয়েকটি জায়গায়। সাঁওতালরা অত্যন্ত দরিদ্র, নিরীহ শান্ত প্রকৃতি মানুষ। অল্পতেই তারা সন্তুট হন। ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে তাদের কোনও উচ্চাশা বা চিন্তাভাবনা থাকে না। তাই চরভূমির জমি বণ্টনের নাম শুনেই পাড়ার কয়েকটি তরুণী গান গেয়ে বলেছে—

"চেতান দিশ মরেন আমিনবাবু
লতার দিশমরে আড়গুএনা,
জমি কিন সংইদা
জমা কিন চ্যাপওইদা
গরিব হড় ওকারে অ্যাম-আঃ।"[৫]

চেতনা দিশম অর্থাৎ ওপর মহল থেকে আমিনবাবু— লাতার দিশম অর্থাৎ আদিবাসী সমাজে নেমে এসেছেন, জমি মাপছেন, খাজনা বাড়িয়ে দিচ্ছেন, গরীবলোক আমরা কোথায় পাব।

গানের পাশাপাশি চরভূমির সাঁওতাল মোড়ল কমল মাঝির নাতনি সারীর সঙ্গে এক নাম না জানা তীরন্দাজ যুবকের বিবাহের কথা লেখক আলোচ্য উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তবে তা অতি সংক্ষিপ্ত। উপন্যাসে দেখি বৃদ্ধ কমল মাঝি রাঙাবাবু ওরফে অহীন্দ্রকে বলেছে—

> "ওই যে আমার লাতনিটি—সেই লম্বাপারা, তারই বিয়া হবে। তাথেই সব মাতন আছে আমাদের, হাঁড়িয়া খাবে সব, নাচবে, গান করবে।"[৬]

তারাশঙ্কর গ্রামীণ জীবন থেকে উঠে আসা গ্রামীণ সমাজ জীবনের কথাকার। অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন বীরভূম জেলার সাঁওতালদের নাচ ও গানকে।

'কালিন্দী' উপন্যাসে তিনি দুবার সাঁওতালদের নাচের প্রসঙ্গকে এনেছেন। একবার উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ে আর একবার অহীন্দ্রের আর্শীবাদ অনুষ্ঠানে। রাঙাবাবুর আর্শীবাদ অনুষ্ঠানে সাঁওতালদের নাচের কথা বলতে গিয়ে লেখক বেলেছেন যে, —

> 'পরস্পরের কোমরে জড়াইয়া ধরিয়া সাদা ধবধবে কাপড় পরা কালো মেয়েগুলি অর্ধচন্দ্রকারে সারি বাঁধিয়া জলের ঢেউয়ের মত হিল্লোলিত ভঙ্গিতে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে, সম্মুখের পুরুষেরা মাদল, নাগরা, বাঁশী ও নিজেদের তৈয়ারী সারঙ্গ বাজাইয়া ঝড়ের দোলায় আন্দোলিত শালের মত দীর্ঘ আন্দোলিত ভঙ্গিতে দীর্ঘ দৃঢ় পদক্ষেপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে।"[৭]

সাঁওতালদের এই নাচ দেখে তারাশঙ্কর তাই যর্থাথই বলেছেন— 'এমন সুন্দর ইহাদের নাচ আর এত সুন্দর ইহাদের একটানা সুরের সুকণ্ঠের গান যে তাহা দেখিবার ও শুনিবার লোভ সম্বরণ করা যায় না'।

সাঁওতাল জাতির স্বভাব ও প্রকৃতি : প্রকৃতির কোলে লালিত সাঁওতাল জাতি প্রকৃতির মতোই অত্যন্ত সহজ সরল ও শান্ত। জমিদার ইন্দ্ররায়ের কথায়—

> "সাধারণত সাঁওতালরা অত্যন্ত শান্ত নীরিহ প্রকৃতির জাতি-মাটির মত; উত্তপ্ত সহজে হয় না, কখনো কখনো ভিতর হইতে প্রলয়াগ্নিশিখা বুক ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু সেও শতাব্দীতে একবার হয় কিনা সন্দেহ।"[৮]

তবে শান্ত হলেও সাঁওতালরা বড্ড জেদী এবং একরোখা। একবার যদি কোনো কিছুতে না বলেছে তবে শত চেটাতেও তাদেরকে হ্যাঁ করানো যায় না। সাঁওতালদের এই স্বভাব-চরিত্রকে লেখক যথাযথ ভাবে স্থান দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। কালিন্দী উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মজুমদারের কথায়— 'আচ্ছা একগুয়ে বোকা জাত। যা ধরবে তা আর সহজে ছাড়বে না।' তাদের মনে কোন হিংসা বা কুটিলতা নেই। চরভূমির জমি বন্টনকালে সারীর কথায় মুগ্ধ হয়ে অহীন্দ্র বলেছেন— "সরল বর্বর জাতি সার্থকে গোপন করিতে জানে না, সার্থহানিতে পরম আপন জনের সঙ্গেও কলহ করিতে দ্বিধা করে না"।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 322 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাঁওতাল জাতি কঠোর পরিশ্রমী। অসম্ভব তাঁদের জীবনীশক্তি। কখনো তারা কাজে ফাঁকি দেয় না। আকণ্ঠ হেঁড়িয়া, পটুই মদ খেয়ে সারারাত নাচ গান করে পরদিন অনায়াসে মাঠে-ঘাটে, কলকারখানায় রৌদ্রে বাদলে দিনের পর দিন কাজ করে যেতে পারে। উপন্যাসে কারখানার মালিক বিমলবাবু যথার্থই উপলব্ধিধ করে মিত্তিরকে বলেছেন—

> "অদ্ভুত জাত মশায় এরা, যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি কি খাটে। আমাদের দেশী লোকের মত নয়, ফাঁকি দেয় না।"[৯]

শুধু তাই নয়, সাঁওতালদের আত্মমর্যাদা প্রবল, বিশেষ করে সামাজিক ক্ষেত্রে। সমাজ বর্হিভূত কোনো বে-আইনি কাজকে তারা সমর্থন করে না। কমল মাঝির নাতনী সারী বিবাহিত, স্বামী থাকা সত্ত্বেও ভিন্নধর্মী পরপুরুষের সঙ্গে (বিমলবাবু) অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করায়—

> "সাঁওতাল পল্লীর সকলেই একদিক হইয়া সর্দার কমল মাছি ও সারীর স্বামীকে এক ঘরে করিল।"[১০]

এহেন সহজ-সরল শান্তিপ্রিয় জাতিকে শেষপর্যন্ত মহাজন শ্রীবাস পাল ও ব্যবসায়ী বিমল মুখার্জীর গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে নিজস্ব ভিটে মাটি ছেড়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সাঁওতালরা এমন এক ধরণের জাতি যে, না খেয়ে মরবে তবু ভিক্ষে করে না। কারণ আদিবাসী তথা সাঁওতলাদের দৃটিতে একমাত্র— "গুগা (বোবা) ভিখ করে গো। কাঁড়া (অন্ধ) ভিখ করে গো! লেড়া (খোঁড়া) ভিক করে গো!"

সাঁওতাল বিদ্রোহ : কৃষিজমিকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্কর আলোচ্য উপন্যাসে সাঁওতালদের দু-ধরনের মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন। পরাধীন ভারতে ইংরেজ, জমিদার ও মহাজনদের নির্মম শোষণ পীড়ন থেকে মুক্ত হবার জন্য সাঁওতালরা সিধু কানুর নেতৃত্বে যে রণক্ষয়ী-আপোষহীন সংগ্রাম করেছিল ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পর আদিবাসী তথা সাঁওতালদের মধ্যে আর সেই ঐক্যবদ্ধতা বা বিদ্রোহ মানসিকতা দেখা যায়নি। কৃষিজমিকে কেন্দ্র করে সাঁওতালদের এই যে দুধরনের মানসিকতা অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের আগে এবং পরে তা উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র কমল মাঝির মধ্য দিয়ে লেখক স্পট করে তুলেছেন। উপন্যাসে দেখি বৃদ্ধ কমল মাঝি তাদের রাঙাবাবু অহীন্দ্রকে ১৮৫৫ সালের সিধু কানুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সাঁওতাল বিদ্রোহের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানায় যে—

> "দাড়িওয়ালা মহাজনকে জমিদারকে ধরলম, ভাল পাঁঠা বলে বোঙার কাছে কাটলম। একটা গোমস্তা জলে নামল, তীর দিয়ে তাকে বিঁধলম। তারপর টেনে তুলে— পেরথম কাটলম পা। বললম, এই লে চার আনা সুদ। তারপর কাটলম কোমর থেকে, বললম, এই লে আট আনা, সুদ আর খাজনা। কাটলম হাত দুটা, বললম, এই বারো আনা, সুদ, খাজনা, তোর তোহুরী। তারপর কাটলম মাথা, বললম, এই লে ষোল আনা, লিব্যাধি! ফারখত।"[১১]

বৃদ্ধ কমল মাঝির মুখে শোনা সাঁওতালদের এই লোমহর্ষক, নৃশংস কাহিনির মধ্য দিয়ে লেখক আদিবাসী তথা সাঁওতালদের প্রকৃত স্বভাব, চরিত্র ও বিদ্রোহী চেতনাকে স্পট করে তুলেছেন। তারা প্রকৃতির মতো শান্ত হতে পারে কিন্তু কোনো কারণে একবার ক্রুদ্ধ হলে তারা প্রকৃতির মতোই ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। যা ১৮৫৫ সালে সিধু-কানুর নেতৃত্বে পরিচালিত সাঁওতাল বিদ্রোহে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ছোট বেলায় পিসিমার মুখে শোনা, সাঁওতালদের এই ভয়ংকর বিদ্রোহের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি দীর্ঘদিন লেখক দেখতে পাননি, অথচ আদিবাসীদের প্রতি একই রকম শোষণ-পীড়ন, বঞ্চনা অব্যাহত ছিল। তাই তিনি যর্থাথই বলেছেন—

> "সাধারণত সাঁওতালেরা অত্যন্ত শান্ত নিরীহ প্রকৃতির জাতি-মাটির মত; উত্তপ্ত সহজে হয় না, কখনও কখনও ভিতর হইতে প্রলয়াগ্নিশিখা বুক ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু সেও শতাব্দীতে একবার হয় কিনা সন্দেহ।"[১২]

আসলে ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ পরবর্তী আদিবাসী সমাজ বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার মধ্যে অন্যতম হল অর্থনৈতিক কারণ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। মূলত এই দুটি কারণের জন্যই যে আদিবাসী সমাজ দীর্ঘদিন ঐক্যবদ্ধ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 322 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হতে পারেনি তারাশঙ্করের চোখে তা সঠিকভাবেই ধরা পড়েছিল। তাই অহীন্দ্র কমল মাঝির কাছে— 'আবার তোমাদের ঠকালে তোমরা খেপবে' জানতে চাইলে কমল নিজের সঙ্গীদের দেখিয়ে বলে—

> "ইয়ারা সব আর সি সাঁওতাল নাই। ইয়ারা মিছা কথা বলে, কাজ করতে গিয়ে গেরস্তকে ঠকায়, খাটে না, ইয়ারা লোভী হইছে। পাপ হইছে উয়াদের। উয়ারা খেপতে পারবে না। উয়ারা ধরম লষ্ট করলে।"[১৩]

বাস্তবিকই ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহে সিধু কানুর মতো মহান নেতার মৃত্যু সাঁওতালদের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে গভীর শূন্যতার সৃটি করে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর মতোই সিধু কানুর মৃত্যু সাঁওতাল সমাজে গভীর শূন্যতার সৃটি করে, যা আজ অব্দি পূরণ হয়নি। তবে আদিবাসীদের প্রতিবাদ বিমুখতার মূল কারণ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। দৈনন্দিন জীবনে তীব্র অভাব-অনটনই সাঁওতালদেরকে অত্যাচারী শোষক শ্রেণির বিরুদেধ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। পুতুল নাচের ওস্তাদ চূড়া মাঝির উক্তিতে যা স্পটভাবে ফুটে উঠেছে।

> "টাকা লইলে কিছু হয় না বাবু, টাকা নাই, খেপে কি করব? আর বাবু খেপে ম'রেই যদি যাব তো খেপলম কেনে বল? বুদ্ধি করলম ইবার আমরা।"[১৪]

তারাশঙ্কর তাঁর 'কালিন্দী' উপন্যাসে সাঁওতালদের কৃষিভিত্তিক জীবন থেকে কারখানার শ্রমিক জীবনে রূপান্তরিত হবার অনুপম চিত্র অঙ্কন করেছেন। পাশাপাশি আজীবন সহজ-সরল, সৎপথে জীবন অতিবাহিত করা সাঁওতালরা যে আর রগুক্ষয়ী সংগ্রাম পছন্দ করছে না তারও আভাস লেখক এই উপন্যাসে দিয়েছেন।

মোটকথা ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ দরিদ্র সাঁওতালদের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সিধু কানু নামে দুই সাঁওতাল বীরের মৃত্যু সমগ্র আদিবাসী সমাজকে দিশেহারা করে তোলে। বিদ্রোহ দমনের নামে সেদিন ইংরেজ সৈন্যবাহিনী সামরিক আইন জারি করে যে কঠোর দমন পীড়ন শুরু করেছিল তাতে সাঁওতাল সমাজ সাময়িকভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। নিজেদের জীবন ও পরিবারকে বাঁচানোর জন্য সাঁওতাল সমাজের মানুষেরা সিধু কানুর সংগ্রামী পথ থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে থাকে। আর এজন্যই বোধহয় 'কালিন্দী' উপন্যাসে সমাজ বর্হিভূত কাজের জন্য কমল মাঝি ও তার পরিবারকে নিজেদের সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করে এক ঘরে করে দিলেও লোভী, অত্যাচারী, নারীলোলুপ কলমালিকের হাত থেকে সারিকে উদ্ধার করে আনতে পারেনি। অথচ ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহে ভিটে মাটি উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্যই আদিবাসী সমাজের পূর্বপুরুষেরা জীবন দিয়েছিল। এককথায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আদিবাসীদেরকে ধীরে ধীরে প্রতিবাদ বিমুখ করে তুলতে থাকে। সিধু কানুর উত্তরসূরীদের এই প্রতিবাদ বিমুখতার রূপ দেখেই অহীন্দ্র শোষক বিমলবাবু সম্পর্কে বলেছে—

> "নিরীহ সরল জাতির নারী কাড়িয়া লইয়াছে, ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে। আর তাহাদের পৃথিবীতে আছে কি? আর কি অপদার্থ ভীরু জাতি এই সাঁওতালগুলা। তীর ধনুক লইয়া কারবার করে, বুনো শুকর মারিয়া খান। কুমীর মারে, বাঘও নিস্তার পায় না, অতি কদর্য ভয়াল অজগর, ওই সারির স্বামীই সে অজগরটাকে বধ করিয়াছিল; আর এটাকে পারিল না।"[১৫]

সাঁওতালদের এই প্রতিবাদ বিমুখতা দেখে রাঙাবাবু অহীন্দ্র কিছুটা বিস্মিত। কারণ যে সাঁওতালরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য ইংরেজদের বন্দুকের সামনে 'এই গুলি খেয়েলিলম' বলে ভরা ময়ুরাক্ষী নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সিধু কানুর উত্তরসূরী হিসেবে তাদের এই আচরণ সম্পূর্ণ বেমানান। শুধু তাই নয়, উপন্যাসের শেষদিকে দেখি চিনির কলমালিক বিমল মুখার্জি ও মহাজন শ্রীবাস পাল সাঁওতালদের সমস্ত জমিজমা, ভিটেমাটি দখল করে কালিন্দী চর থেকে তাদেরকে উৎখাত করলেও তারা কোনোরূপ প্রতিবাদ করেনি। অত্যাচারী, লোভী শোষকদের অন্যায়ের বিরুদেধ কোনো প্রতিবাদ প্রতিরোধ না করেই নীরবে কালিন্দীর চর ছেড়ে তারা চলে গেছে। লেখকের কথায়—

> "পুরুষ-নারী-শিশু, গোরু-মহিষ-ছাগল সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। পুরুষদের কাঁধে ভার মেয়েদের মাথায় বোঝা, গোরু-মহিষের পিঠে ছালার বোঝাই জিনিসপত্র নীরবে তাহারা পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে।"[১৬]

আসলে তারাশঙ্কর তাঁর 'কালিন্দী' উপন্যাসে সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্দ্রের সঙ্গে বণিকতন্ত্রের দ্বন্দ্বকেই মূল উপজীব্যে বিষয় করে তুলেছেন। উপন্যাসে সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রসঙ্গ থাকলেও লেখক তাকে ব্যবহার করেছেন পশ্চাৎ পটভূমি হিসেবে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 322 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ফলে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বণিকতন্ত্রের দ্বন্দ্বকে দেখাতে গিয়ে সাঁওতালদের সমাজজীবনকে অঙ্কন করলেও 'কালিন্দী' উপন্যাসে লেখক অতি সন্তর্পনে এড়িয়ে গেছেন শ্রেণিসংঘর্ষের পথ।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা ভারতের আদিম অধিবাসী হলেও উচ্চবর্গ তথা শিক্ষিত মানুষের কাছে আজও তারা অবহেলিত-অপাঙতেয়। অরণ্যের কোলে বসবাসকারী সাঁওতাল সম্প্রদায় সমতলের অন্যান্য মানুষদের মতো সুযোগ সুবিধা থেকে আজও বঞ্চিত, তাদের মধ্যেকার কুসংস্কার, দারিদ্রের সংকট আজও দূরীভূত হয়নি। অরণ্যের ভূমিপুত্র হওয়া সত্ত্বেও বারবার তাদেরকে উচ্ছেদ করে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতোর পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে সাঁওতালরা আজও প্রান্তিক জনগন হয়েই রইল। স্বাস্থ্য শিক্ষা-আর্থ-সামাজিক সমস্ত দিক থেকে আজ তারা পিছিয়ে। এর মূল কারণ 'কালিন্দী' উপন্যাসের জমিদার ইন্দ্র রায়, মহাজন শ্রীবাস পাল ও কারখানার মালিক বিমল মুখার্জীর মত মানুষেরা। যারা চিরকাল আদিবাসী তথা সাঁওতালদেরকে নিজেদের কায়েমী স্বার্থেই ব্যবহার করে এসেছেন। সাঁওতাল জাতির উন্নতি তো দূরের কথা বিন্দু মাত্র তাদের প্রতি শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি দেখাননি। এহেন নির্দয়-স্বার্থান্বেষী মানুষদের প্রতি তারাশঙ্করের তীব্র ক্ষোভ যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি সাঁওতালদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে কখনো শিক্ষক কন্যা সুনীতির মাধ্যমে কখনো 'রাঙাবাবু' ওরফে অহীন্দ্র চরিত্রের মাধ্যমে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিকতা কতটা ছিল তা আমরা দেখতে পাই 'অরণ্যবহ্নি' (১৯৬৬) উপন্যাসের প্রস্তাবনা অংশে, যখন তিনি— "একটি আদিম উন্নত জাতির বর্বর অভ্যুত্থান" বলে শ্রদ্ধা জানান।[১৭]

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, কালিন্দী, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ. লি. কলকাতা, চর্তুদশ মুদ্রণ, ১৪১২, পৃ. ২০
২. তদেব, পৃ. ৬৯
৩. তদেব, পৃ. ৮২
৪. তদেব, পৃ. ১২৫
৫. তদেব, পৃ. ৭৮
৬. তদেব, পৃ. ৭২
৭. তদেব, পৃ. ১৭৭
৮. তদেব, পৃ. ৩৭
৯. তদেব, পৃ. ১৪১
১০. তদেব, পৃ. ১৫৭
১১. তদেব, পৃ. ৭১
১২. তদেব, পৃ. ৩৭
১৩. তদেব, পৃ. ৭১
১৪. তদেব, পৃ. ৭২
১৫. তদেব, পৃ. ১৮৭
১৬. তদেব, পৃ. ২১৩
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, অরণ্যবহ্নি, তারাশঙ্কর রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ. লি. কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ২৬৮

Bibliography:

মাঝি রামদাস টুডু রেস্কা, খেরওয়াল বংশধরমপুঁথি, মনফকিরা, মুকুন্দপুর, কোল-৯৯
দেবসেন সুবোধ, বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ, পুস্তকবিপনি,২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কোল-৯
বন্দ্যোপাধ্যায় সুমহান, প্রসঙ্গ আদিবাসী, অফবিট পাবলিশিং, লেকটাউন, কোল-৮৯